OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 933 - 941
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শিকাগো ধর্মমহাসভা : নিঃস্ব সাধুর বিশ্বজয়

স্বাগত ব্যানার্জ্জী
Email ID : swagata2121@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Mystical impact of Sri Ramakrishna, Chicago Speech, The Cyclonic Hindu Monk Swamiji.

Abstract
The Cyclonic Hindu Monk Swamiji after passing away of Sri Ramkrishna paramhansa in August 1886, spent several years in intense spiritual practices. He gradually realised that he was not meant to live the life of an ordinary recluse, struggling for personal salvation. He was destined to work for divine mission entrusted to him before his master, Sri Ramakrishna. The master had told him before his passing away that he would have to do mother's work to teach mankind and to be like a banyan tree, giving shelter to the tired and weary travellers. It was under Ramakrishna's mystical impact that Vivekananda felt himself to be a capable apostle of Hindu Vedanta Philosophy. He set sail for America to take part in world Religion Congress to present the West the authentic Hindu view of life. His profound and eloquence speech held the audience spellbound and for the first time in the modern era the West heard from the lips of the young Hindu Yogi the truth of Hinduism of which they had been ignorant till then. Swamiji's view was lauded with great appreciation. Many people became his disciples, who later joined the Ramakrishna Mission. Man is the builder of his own destiny. So each human being with his own capacity can guide himself, and at the same time can play a key role in the society. In his deep lecture Swami Vivekananda explained to the world that God is the one big sea, and all religions are like rivers ultimately merging in the sea. Much of his speech on Hinduism is taken up with explaining the major teaching of Vedas. Vivekananda addressed the assembly on six different occasions in 1893 the Response to the Welcome on September 11, 'Why We Disagree' on September 13, 'Paper on Hinduism" on September 19, 'Religion Not the Crying Need of India' on September 20, 'Buddhism the Fulfilment of Hinduism' on September 26, and addressed the final session on September 27. For him every single Soul is divine. The aim is to channelize this divinity within by controlling nature's external and internal issues. He was a role model not only the people of his country but also to the whole world.

Discussion

পরাধীনতার নিরন্ধ অন্ধকারে নিমজ্জিত আত্মবিস্মৃত এই মহাজাতিকে প্রকৃত ভারত সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কে? কে এই শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে বৈদান্তিক সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এক আদর্শ বেগবান সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার স্বদেশপ্রেমিক ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে? কে নবযুগের জীয়ন কাঠির স্পর্শে এই জীবন্মৃত জাতির অনড় দেহে সঞ্চারিত করলেন

অভূতপূর্ব প্রাণের স্পন্দন? কার উদাত্ত আহ্বানে আকুমারিক হিমাচল যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠেছিল? পরাধীন, হৃতসর্বস্ব, আত্ম বিস্তৃত জাতি ফিরে পেল তার আত্মশক্তি ও লুপ্ত বিশ্বাস কার প্রচেষ্টায়? কে দিশাহারা জাতিকে এতদিনে খুঁজে দিলো তার প্রকৃত আত্মপরিচয় লাভ করার যথার্থ মুক্তি পথের সন্ধান? কার উদাত্ত বজ্র ঘোষণা জাতির নিস্তরঙ্গ জীবনে আনল দুর্বার যৌবন তরঙ্গ? তিনি হলেন অমৃত শক্তিধর নবজাগরণ মন্ত্রের উদ্যোক্তা বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। স্বামীজি পাশ্চাত্য জগতের সামনে আবির্ভূত হন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শিকাগো ধর্ম সভার মাধ্যমে তার এই আবির্ভাব যেমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি বর্ণময় ও নাটকীয়, স্বয়ং বিশ্ব নিয়ন্তার পরিকল্পনায় মানুষের মানব কৌতূহল নিবারনের জন্যই যেন এই ধর্মসভার আয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দী যেন এক গোত্রহীনকাল (An age without a name)। এই কালের মধ্যে ছিল না কোন থেমে যাওয়ার লক্ষণ। ছিল না কোনো বিশেষ চিন্তার প্রাধান্য। গত শতাব্দীর পৃথিবী যেন এগিয়ে চলেছিল এক বিচ্ছিন্নতা ও ঘূর্ণবাতের মধ্যে দিয়ে। আশা নিরাশা, বিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের মনকে করে তুলেছিল অস্থির ও বিচলিত, দার্শনিক চিন্তার সৌধগুলি যেন ক্রমাগত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইটহেড বলেছিলেন -

> "বিগত শতাব্দীগুলির তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দী সত্যিই এক অস্থিরতময় যুগ। তখন প্রতিটি মানুষেরই চেতনা ছিল দ্বিধা বিভক্ত। ধর্মতাত্ত্বিকবিদ ও দার্শনিকেরা সমস্যাকে ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছিলেন তারা মনে করতেন যে তাদের মতবাদই চরম সত্য; ফলে তাদের সকল প্রয়াসই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল।"[১]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গতানুগতিক খ্রিস্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য থাকার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আসে এক বিপর্যয়, যে বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ দুই পক্ষের মধ্যে মিলন ঘটানো হয়ে ওঠে কঠিন আর এই মিলনের চেষ্টায় হোয়াইটহেডের মতে সেই বিতর্কের সৃষ্টি করে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে বার্ট্রান্ড রাসেল তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন -

> "মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত ও অসহায়। তার নিজের ও সমগ্র মানবজাতির উপরে ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে এক নিশ্চিত অন্ধকার। ভালো মন্দ সম্পর্কে উদাসীন, ধ্বংসোদ্যত। সর্বগ্রাসী জড়পুঞ্জ অস্থির গতিতে এগিয়ে আসছে।নিজের প্রিয় জিনিসগুলি ক্রমশই চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে।আগামীকাল মানুষ কে নিজেই যেতে হবে অন্ধকারের রাজত্বে। চরম বিপর্যয় এখনো আসেনি। ভাগ্যের হাতে ক্রীতদাস হয়ে তাকে চলতে হবে, নিজের তৈরি মন্দির হবে তার উপাস্য, দৈব ঘটনায় হতবাক হয়ে কাটাতে হবে জীবন, অস্থির জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে নয়তো তার জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা জরাজীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করবে, যে পৃথিবী অচেতন শক্তির ক্রিয়া হিসেবে তার নিজেরই সৃষ্টি।"[২]

এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বক্তার সাহসিকতা ও মানব মনের অসহায় অবস্থার কথাই উচ্চারিত হয়েছে সবকিছুর উপরে ছিল মানুষের অবিশ্বাস, জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত, শাশ্বত সত্তার উপরে ছিল চরম সন্দেহ, সত্যকে আবিষ্কার করার ছিল অযৌক্তিক, এক কথায় বলা যায় তখন ধর্ম জীবন থেকে হয়েছিল বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত। এটাই ছিল সেই উপযুক্ত সময়, যে সময় ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, সেই সময় যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে যখন মানুষ তাকে ভুলে যাবে কিন্তু তাদের সমস্ত আর্তি ঈশ্বরের জন্য উন্মুখ হবে, তখনই তিনি আসবেন।

> "হে অর্জুন যখন ধর্মের পতন হবে আর অধর্মের উত্থান দেখা যায় আমি তখনই নিজেকে প্রকাশিত করি।"[৩]

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়টা ছিল বসন্ত ঋতু পাশ্চাত্যে যাওয়া নিয়ে স্বামীজি যখন ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত ঠিক সেই সময় পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ তাকে দেখা দিলেন এবং আদেশ দিলেন পাশ্চাত্যে যেতে তিনি তাকে বারবার বলতে থাকেন -

> ""আমার কাজের জন্য এসেছিস; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ওই সভার আয়োজন জানবি।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরমপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি তার ধর্ম মহাসভায় যোগদানের পিছনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা দেখতে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যে যাবার প্রাক্কালে স্বামীজি তার গুরু ভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাহাড়ে বলেছিলেন -

> "হরি ভাই ওই ধর্ম মহাসভা- টভা যা হতে চলেছে তা এর জন্যই (নিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে), আমার মন তাই-ই বলছে দেখবে, শিগগিরই এটি ফলে যাবে।"[৫]

সকলের কাছে যিনি সাক্ষাৎ ভগবতী এবং পরম পুরুষ রামকৃষ্ণের আরেক রূপ সেই মা সারদা দেবীকে স্বামীজি চিঠি লিখলেন অনুমতি চেয়ে, শ্রী শ্রী মা সারদা তার চিঠির উত্তরে তাকে আশীর্বাদ পাঠালেন মায়ের আশীর্বাদ পাওয়ার সাথে সাথেই স্বামীজি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তার পাশ্চাত্য যাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ১৮৯৩ এর ৩১শে মে স্বামীজি পেনিসুলার নামক জাহাজ করে বোম্বে থেকে রওনা দিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে, যেতে যেতে জাহাজ বদল করে কানাডার ভাঙ্কুয়াড়ে পৌঁছালেন স্বামীজি ২৫ জুলাই তারিখে। তারপর রেলপথে করে ৩০শে জুলাই ১৮৯৩ পৌঁছালেন শিকাগো শহরে। ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই বিরাট প্রদর্শনীর প্রায় সবটাই সংঘটিত হয়েছিল চার্লস বনি সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনায়। বনিসাহেব ছিলেন একজন উকিল উদার ও পাণ্ডিত ব্যক্তি, তাই তিনি প্রদর্শনীর সাথে সাথে দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, অর্থনীতি আইন, নারী প্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং সবশেষে রাখেন ধর্মের সংযোজন, ধর্মের সংযোজন করার সাথে সাথেই বনি সাহেবকে সম্মুখীন হতে হল প্রবল বাদানুবাদের, ধর্ম এক না বহু? ধর্ম সত্য না মিথ্যা? একদল বললেন -

> "আসুক না অন্য ধর্মের লোক তারা সত্য কি জেনে যাক তাহলে তারা আর মিথ্যার পিছনে ছুটবে না।"[৬]

আর একদল বললেন -

> "যা মিথ্যা তাকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা এ আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুর অপমান।"[৭]

সবশেষে বনি সাহেবের জয় হল খ্রীষ্টান ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর লোভ কেউ সংবরণ করতে পারলেন না পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তা বা মতবাদের সংঘর্ষে জর্জরিত হচ্ছিল তা হল বৈজ্ঞানিক ও ধর্মিয় দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। চার্চের পাদ্রী ও পন্ডিতেরা বাইবেল ও অ্যারিস্টটলীয় লজিক এর সাহায্যে মানুষকে কেন্দ্র করে যে কোন ঘটনার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিশ্ব রহস্যকে জানার কোন তাগিদ তাদের ছিল না। গ্যালিলিও প্রথম দরজা খুলেছিলেন এই অচলায়তনের তাইতো এডুইন আর্থার বার্টের ভাষায় -

> "গ্যালিলিওর দর্শনে এই জগত হল কতগুলি বস্তুপুঞ্জ যা গাণিতিক সূত্রাবুলীর সাহায্যে চলে অর্থাৎ স্থান ও কালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান বস্তু পুঞ্জই হচ্ছে জগৎ।"[৮]

গ্যালিলিওর মতে ঈশ্বরই মূল কারণ তিনি বস্তুতে প্রথম গতি সঞ্চার করেছিলেন এবং তারপর থেকেই বস্তুগুলি নিজে নিজেই কাজ করে যাচ্ছে বার্টের উক্তি -

> "একটি প্রয়োজনীয় কর্তার হিসাবে ঈশ্বরের কাজ যেখানেই শেষ হল তিনি এক বিশাল যান্ত্রিক স্রষ্টা বলে পরিগণিত হলেন যার কাজ পরমাণুর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।"[৯]

তর্কমূলক যৌতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যাকে Deism বলা হয় সংক্ষেপে যা বলেছেন ভলতেয়ার -

> "মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যা নৈতিক বলে মনে হয় তার মিলিত রূপই ধর্ম, বিচারমূলক ধর্ম।"[১০]

এক কথায় বলা যায় পাশ্চাত্যজগতের মূল সমস্যা ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি এবং তাহা কাহার দ্বারা চালিত হচ্ছে সেটা ছিল তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু। তাই ব্যক্তি ঈশ্বরকে মেনে নিতে তৎকালীন মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে

আপস করে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতেই হয়েছিল। সনাতনী খ্রীষ্টধর্ম এই পথেই সমাধান খুঁজেছিল। এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামীজি তিনি বলেছিলেন -

> "কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়া ভালো।"[১১]

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের পথে বেশ কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় স্বামীজিকে, প্রথমত ধর্ম মহাসভার যোগ দেবার শেষ তারিখ পার হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত তার কাছে কোনো পরিচয় পত্র ছিল না, তাই স্বামীজি ধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন কয়েকশো মাইল দূরে বষ্টনে। বষ্টনে গিয়ে পরিচয় হল হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে। স্বামীজীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন -

> "আপনার কাছে পরিচয় পত্র চাওয়ার অর্থ হচ্ছে সূর্য কে জিজ্ঞাসা করা তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা?"[১২]

অধ্যাপক রাইট এর প্রচেষ্টায় স্বামীজী একটি পরিচয় পত্র পেলেন এবং শিকাগো এসে পৌঁছালেন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সন্ধ্যায়। এই ধর্মসভা চলে ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ধর্ম মহাসভার প্রথম দিন ৫ মিনিটের জন্য বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান অনাহত এই হিন্দু ধর্ম প্রচারক। একসময় আরোহন করলেন বক্তৃতা মঞ্চে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করলেন গুরুদেবকে তারপর শ্রোতাবর্গকে আত্মীয়তার উষ্ণ আবেগে সম্বোধন করলেন, মুহূর্তের উচ্ছ্বাসিত করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত হলেন হল প্রাচ্যের এই সন্ন্যাসী। তার প্রথম ভাষণটি ছিল খুব ছোট, তিনি বলেন -

> "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি, বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সমুদ্রে এসে সব এক হয়ে যায়। তেমনি ভগবান আমাদের সকলের লক্ষ্য। আমাদের বিভিন্ন রুচি, তাই আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে চলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হে ভগবান তোমার কাছেই আমরা পৌঁছাব।"[১৩]

এ এমন একটা অসাধারণ কোন বক্তৃতা নয়, তবু শ্রোতারা এত উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো কেন? লই বার্কের মতে এ শুধু আবেগ নয়, ভাবুকতা নয় এ কথাগুলির পিছনে ছিল এক বিস্তৃত সত্য যে সত্য আমাদের আত্মিক ঐক্য। স্বামীজীর কথাগুলি সেই ঐক্যবোধকে উজ্জীবিত করে দিয়েছিল। স্বামীজীর কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি যেন তার সমস্ত সাধনার তেজ ও বল অনুভব করলেন। লুই বার্ক বলেছিলেন - এই ঐক্যবোধ 'গোপনে অথচ অলঙ্ঘ্য শক্তিতে কাজ করবে।'[১৪]

যার ফলস্বরূপ সভ্যতার রূপ পাল্টে যাবে। মানুষকে মহৎ থেকে মহৎ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই ব্যক্তি মহৎ হতে পারে, যার মধ্যে ক্ষমা প্রেম উদারতা থাকবে। তিনি বলতেন যিনি বলবান তিনি বল প্রয়োগ করুক গঠনের পথে, কল্যাণের পথে, পরার্থে, শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। প্রথম প্রথম সভাস্থল ছিল খ্রীষ্ট ধর্মের জয়গানে মুখরিত আর অন্যদিকে চলেছিল অন্যান্য ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা। সভার যারা আয়োজক ছিলেন তারাই এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। একদিন স্বামীজি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামীজীর প্রবন্ধ পাঠের পরে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ চরমে উঠল। তিনি যখন মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন তখন শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। স্বামীজি বললেন -

> "আমরা যারা প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছি দিনের পর দিন এই উপদেশ শুনছি আমরা যেন তাড়াতাড়ি খ্রিস্টান হয়ে যাই, কারণ খ্রিস্টান জাতিরাই সবচেয়ে ধনী। সবচেয়ে ধনী ইংল্যান্ডবাসী। এই দেশটি পাঁচশো কোটি এশিয়াবাসীকে পদদলিত করে রেখেছে। অতীতের দিকে তাকালে দেখি ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে স্পেন থেকে। স্পেন ধনী হয়েছে মেক্সিকোকে সর্বস্বান্ত করে এই রক্তমাংসের মানুষের গলা কেটে খ্রিস্টান ধর্ম ধ্বনি হয়েছে। এই উপায় অবলম্বন করে আমরা হিন্দুরা ধনী হতে চাই না।"[১৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথাগুলো স্বামীজি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অনেকবার তাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। স্বামীজি এক সভায় শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন -

"আপনারা যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দু একখানা পড়েছেন, হাত তুলুন।"[১৬]

মাত্র ৩-৪ জন হাত তুললেন স্বামীজি দুঃখ করে বললেন -

"আপনারা কিছু না জেনে কি করে একটা ধর্মকে আক্রমণ করেন।"[১৭]

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রবন্ধ পাঠ শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠের মধ্যে দিয়ে সকল ধর্মের মূল সত্য সবার কাছে বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজি হিন্দু ধর্মকে নতুন রূপে নতুন ভাবে সাজিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। স্বামীজী কোন বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাশ্চাত্য দেশে যাননি। নিবেদিতা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -

"আপনার জীবনের ব্রত কী?"[১৮]

তার উত্তরের স্বামীজি বলেন মানুষের মধ্যে যে যে সম্ভাবনা আছে তার বিকাশ ঘটানোই মানুষের একমাত্র ধর্ম। সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর থাকেন। মানুষের উচিত জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেই দেবত্বকে কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় তার চেষ্টা করা। প্রত্যেকটি মানুষ অমৃতের সন্তান মানুষ পাপী নয়, মানুষ ভুল করে, কিন্তু চেষ্টা করুক ভুলকে সংশোধন করে নিতে। যে মানুষ আজ পাপী আগামী দিনে সেই পুণ্যাত্মা। সে তার নিজের ভাগ্য বিধাতা নিজেই। তাই সে ইচ্ছা করলেই অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীজি প্রচার করেন ভারতের উদারতম সত্য। তিনি বলেন সত্য কোন একটি ধর্মের সম্পদ নয় সব ধর্মের মধ্যেই সত্য বিরাজমান। সত্য প্রেম পবিত্রতা ক্ষমা উদারতা এই গুণগুলি সব ধর্মের মধ্যেই বিরাজমান। স্বামীজি বলতেন -

"সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।"[১৯]

তিনি এই সত্যকে প্রচার করেছিলেন, ভারত যে সত্যের উপাসক।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই সত্য ভারত, ভারতই এই সত্য। ভারতকে ভালবাসবো কেবল জন্মভূমি বলে নয়, ভারত পুণ্যভূমি, এই সত্যের প্রতীক।

স্বামীজি জাতিভেদ মানতেন না, সব জাতি ও সব ধর্মের মানুষ ছিল তার বন্ধু তার নিজের লোক। একবার এক নিগ্রো জাতির মানুষ তাকে ভুল করে নিগ্রো ভেবে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বুঝিয়ে দেননি যে তিনি নিগ্রো নন। একবার এক হোটেলে তাকে নিগ্রো ভেবে হোটেল মালিক থাকতে দেননি তবু তিনি নিজেকে পরিচয় দেননি যে তিনি নিগ্রো নন। তিনি বলতেন -

"কাউকে ছোট করে বড় হতে বিবেকানন্দ জন্মায়নি।"[২০]

তিনি সবসময় বলতেন তিনি যেমন শ্বেতকায়ের বন্ধু তেমনি কৃষ্ণকায় নিগ্রোদেরও বন্ধু।

শিকাগো ধর্ম মহাসভা সংঘটিত হয়েছিল ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। ধর্ম মহাসভার প্রথম দিনের বক্তৃতার পরেই তিনি গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তারপর তিনি ধর্ম মহাসভার মূল শাখা ছাড়াও আরো অনান্য বিজ্ঞান শাখায় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন ১৯ সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' সভায় বক্তৃতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 'সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা' এবং ২৭ সেপ্টেম্বর বিদায়ী ভাষণ।

ধর্ম মহাসম্মেলনের ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে স্বামীজি কুয়োর ব্যাঙের গল্পের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের নিজেদের অহমিকাকে ভুল প্রমাণিত করলেন এবং প্রমাণিত করলেন ভারতবর্ষ কিন্তু পাশ্চাত্যের থেকে কোন দিকে কম নয়। স্বামীজি বুঝিয়েছিলেন ভারতের সমস্যা ধর্ম নয়, সমস্যা হল ভারতের অন্নের। স্বামীজীর প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছিল পাশ্চাত্য, এবং তারা অকপটে স্বীকার করেছিল যে ভারতের কাছে ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শেখার আছে। স্বামীজী কোন ধর্মকেই ছোট করে দেখতেন না, তিনি বলতেন -

"খ্রীষ্টান আরো ভালো খ্রিস্টান হোক, হিন্দু আরো ভালো হিন্দু, মুসলমান আরো ভালো মুসলমান হোক।"[২১]

তাঁর এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খ্রিস্টান জগত তথা পাশ্চাত্য কখনোই পরিচিত ছিল না। স্বামীজীর সাথে পরিচয় এরপর পাশ্চাত্যের সংকীর্ণতা বা উন্নাসিকতা ধীরে ধীরে শিথিল হতে লাগলো। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার গুণে আমেরিকার লোক বলতে শুরু করল -

"আমরা এঁর দেশে মিশনারি পাঠাই? এঁদেরই উচিত আমাদের দেশে মিশনারি পাঠানো।"[২২]

বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন মারউইন-মেরী স্নেল তিনি লিখলেন -

> "হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন মহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। খ্রীষ্টান বা অখ্রীষ্টান যে কোন বক্তার চেয়ে শ্রোতারা তাঁকেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করত। যেখানেই তিনি যেতেন, লোকে তাকে ঘিরে থাকতো আর তাঁর প্রতিটি কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। যারা অত্যন্ত গোঁড়া খ্রিস্টান, তাঁরাও তাঁর সম্বন্ধে বলতেন যে, তিনি সত্যিই মানুষের মধ্যে রাজা। ... আমেরিকা ভারতবর্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁকে পাঠানোর জন্য এবং ভারতবর্ষের কাছে আমেরিকার প্রার্থনা: তাঁর মতো এই রকম মানুষ যেন সে আরো বেশি সংখ্যায় পাঠায়।"[২৩]

শিকাগো ধর্ম সভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর বেশ কিছু পাশ্চাত্যবাসীর মনে এক বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে আরো গভীরতা ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল। বেশ কয়েক হাজার নারী পুরুষ তাঁর মহত্ব ও গভীরতা বুঝে নিজেদের জীবন উন্নত করেছিল। বেশ কিছু পাশ্চাত্য মনীষী যেমন উইলিয়াম জেমস্, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, ম্যাক্সমুলার, লিও টলস্টয়, এরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বামীজীর ভাবধারায়।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল ছিল তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের উপর তার প্রভাব। ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় এতদিন যে গোঁড়া মনোভাব ছিল তা দূর হয়ে গিয়েছিল স্বামীজীর বক্তৃতায়। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও জীবন চর্চার গভীর সমস্যার যথার্থ সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন বাণীর মধ্যে দিয়ে। স্বামীজী নিজ বানীর যে বীজ বপন করেছিলেন তা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল মানুষের জীবন ও পাশ্চাত্য জগতের সমগ্র চেতনার মধ্যে দিয়ে। বর্তমান যুগে প্রাচ্য ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি আমেরিকাবাসীর যে আগ্রহ, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তার মূলে আছে স্বামীজীর বক্তৃতার প্রভাব। এই প্রসঙ্গে কিপলিং বলেছিলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কখনো মিলবে না। না মিললেও পরস্পর পরস্পরকে জানবে জানার পরে উভয় উভয়ের কাজ কিছু কিছু নেওয়া দেওয়া শুরু করবে। আর সে, দুই দেশের মধ্যেই শুভ হবে।

স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রাচ্য বিশেষত ভারত পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিখুক। আর পাশ্চাত্য ভারত থেকে শিখুক ধর্ম। স্বামীজি ধর্ম মহাসম্মেলনের পরেও বেশ কিছুদিন আমেরিকায় থেকে যান। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় দ্রুতগতিতে গিয়ে গিয়ে বক্তৃতা করতে থাকেন। খবরের কাগজে স্বামীজি 'The Cyclonic Hindu Monk' বলে প্রকাশিত হলেন। মানব জীবনের উচ্চতম আদর্শ হলো পূর্ণতা, এটাই ছিল স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু। তিনি বলতেন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ত্রুটি হল বাণিজ্য কেন্দ্রিক সভ্যতা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠুর যুদ্ধ প্রবণতা ও আত্মতুষ্টি।

স্বামীজি প্রত্যাবর্তনের সময় একজন আমেরিকাবাসী জাহাজঘাটে বিদায় দিতে এসে জিজ্ঞাসা করেন যে পাশ্চাত্যের এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকার পরেও ভারতে গিয়ে দরিদ্রের মধ্যে থাকতে কষ্ট হবে কি না? তার উত্তরের স্বামীজি বলেছিলেন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। আমি চিরদিন ভারতবর্ষকে খুব ভালোবাসি এখনো তাই। তোমরা বুঝতে পারছ না ভারতবর্ষ কী? তিনি আরোও বলেছিলেন তোমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তোমারা জান না। এটা একটা আগ্নেয়গিরি যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে একটা প্রলয় কান্ড ঘটবে তোমাদের পাশ্চাত্য জগতে। স্বামীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল, শুরু হল ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 104
Website: https://tirj.org.in, Page No. 933 - 941
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন স্বামী বিবেকানন্দ এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কাউকে কোনদিন ছোট করে দেখতেন না কেউ কোনো ভুল করলে তিনি বলতেন -

"যা হয়েছে হয়েছে, এবার আরোও ভালো করো।"[২৪]

কোন ভারতবাসী ভারতের নিন্দা করলে তিনি বলতেন -

"তুমি ভারতের জন্য কি করেছ, যে তুমি সমালোচনা করছ?"[২৫]

তেমনি তিনি পাশ্চাত্যের নিন্দাও পছন্দ করতেন না তিনি বলতেন পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের অনেক কিছু শেখার আছে। পাশ্চাত্যে স্বামীজির শিক্ষাদানের পূর্ণ বা আংশিক আলোচনা সংক্ষেপে করা কঠিন। অদ্বৈতবেদান্তের যে ব্যাখ্যা তিনি জগতের কাছে তুলে ধরেছিলেন, পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা নতুন আলো নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ, সম্বন্ধীয় এমনকি যুক্তি, হৃদয়, আবেগ সম্পর্কে সকল সমস্যার সমাধান তারা খুঁজে পেল; ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগৎ, যুক্তি ও বিশ্বাসের জগৎ, জড় ও ব্যক্তি ঈশ্বরের জগৎ, সবকিছুই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। কিন্তু এসব আপাত সত্য; স্বামীজি বলতেন -

> "আমাদিগকে আরো উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহার দ্বারা যে সগুন ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এরূপ প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম তাহাই একমাত্র ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত; সেই নির্গুণ সত্তাই সত্য, তিনি মানুষের আত্মা।"[২৬]

স্বামীজীর জীবনাদর্শে অদ্বৈত বেদান্তের সমাগম দেখা যায়। তিনি বলতেন যে গত তিনটি শতাব্দী পাশ্চাত্যের যে ধর্ম ও বিজ্ঞান সমস্যা, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্যা তার সবকিছুই অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি সত্যই বলেছিলেন যে বর্তমান জগতের কাছে অদ্বৈত দর্শন ও ধর্ম একান্ত প্রয়োজন।

> "যদি কেহ এই সঙ্গে যুক্তিবিচারশীল এবং ধর্মপরায়ণ হইতে চায়, তবে তাহার পক্ষে অদ্বৈত বেদান্তই একমাত্র পন্থা।"[২৭]
>
> "... ইউরোপের মুক্তি এখন, এই যুক্তি মূলক ধর্ম-অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবেই পন্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ্য। যখনি ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।"[২৮]

সম্ভবত এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই মহান আচার্যকে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জগতে।

স্বামীজির ধর্ম মহাসভার আত্মপ্রকাশ ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন -

> "বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য যাত্রা হল প্রথম লক্ষণ যে, ভারতবর্ষ জাগছে। জাগছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়, জয় করবার জন্য। এই জয় অবশ্যই ভৌগোলিক জয় নয়। ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীকে জয় করে তবে তা করবে ভাবাদর্শের দ্বারা, প্রেম, মৈত্রী ও উদারতার দ্বারা। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতায় তারই সূচনা হয়েছিল।"[২৯]

সবশেষে এ কথা বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মহাসভায় যোগদান একদিকে যেমন নতশির ভারতের দিকে বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ভারতের সমাজকে নবজীবন ও নবযৌবনের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল।

Reference:

১. Whitehead, North Alfred, Science and the Modern World, The Macmillan Company, New York, 1925, P. 119
২. Russel, Bertrand, 'A Free Man's Worship', in Mysticism and Logic, Doubleday and Company, Inc., New York, 1957, P. 54
৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪/৭
৪. উদ্বোধন, ৭৫ বর্ষ পৃ. ৫২৯
৫. Spiritual Talks, Advaita Ashrama, Calcutta, 1955, p. 254
৬. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৫
৭. তদেব, পৃ. ৪৫
৮. Burtt, Arthur Edwing, The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science, Doubleday Anchor Books, New York 1954, P. 33
৯. Ibid. P. 99
১০. Voltaie, Elements de la philosophic de Newton, Chap. 6
১১. স্বামীজির বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ২৬৭
১২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪
১৩. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৭
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪৮
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ৪৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪৮
২০. তদেব, পৃ. ৪৯
২১. তদেব, পৃ. ৪৯
২২. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৫
২৩. তদেব, পৃ. ৫
২৪. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুবনায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস,৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৫২
২৫. তদেব, পৃ. ৫২
২৬. স্বামীজির বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ. ২৬৪-২৬৫
২৭. তদেব, পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, (১৩৮৩), পৃ. ৩০৯
২৮. তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০৩
২৯. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৬

Bibliography

আচার্য, অধ্যাপক পি (রচয়িতা), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা উজ্জ্বল দিগন্ত, বিচিন্তা ভবন, ৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ: এপ্রিল ১৪১৫

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যুব নায়ক বিবেকানন্দ, মানসী প্রেস, ৭৭ শিশির ভাদুড়ী সারণী, কলকাতা-৭০০০০৬, একবিংশতি মুদ্রন, ২০০৭

ভদ্র, কালিদাস (সম্পাদিত), বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনকথা ও গল্প সম্ভার), লতিকা প্রকাশনী, ১০/২, বি রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৮

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক: কলকাতা ৭০০০২৯, সপ্তদশ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২

Bhattacharya, D.P., A Treasure Throve, Chandan Maity, New Light, 10/2B, Ramnath Majumdar Street, Kolkata- 700009, Revised Eight Edition -2014, Reprint - 2018